সত্যজিৎ রায় : ছোটগল্প
নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালির লুকোনো শক্তি

উজ্জ্বল চক্রবর্তী

অসমঞ্জবাবুকে মনে পড়ে? কিংবা, বঙ্কুবাবুকে? বা তুলসীবাবুকে? আমাদের মধ্যে অনেকেই এঁদের গল্প পড়তে-পড়তে বড় হয়েছি।

সত্যজিতের ছোটগল্পের জগৎটাকে চিনতে গেলে, এই সমস্ত বাবুদের কথা আমাদের আগে জানতে হবে।

কেন জানতে হবে? কারণ, তাঁর ছোটগল্পের জগৎটাই গড়ে উঠেছে এই 'ছোটখাটো' মানুষদের নিয়ে। কয়েকটা একই রকম বৈশিষ্ট্য এঁদের সবার মধ্যেই আচে। যেমন, এঁদের মধ্যে প্রায় কেউই বিয়ে করেননি। কেউ প্রেমও করেন না। কেউই জীবনে সেই অর্থে প্রতিষ্ঠিত নন। মানে, এঁরা কেউই কোনও সওদাগরি আপিসের এগজিকিউটিভ নন। তাই বলে তাঁরা কেউ বেকারও নন। নিজের দিনগুলো কাটিয়ে দেবার মতো সামান্য মাইনে তাঁরা সকলেই পান। কেউ পোস্ট অফিসে কাজ করেন। কেউ গ্রামের ইস্কুলের ভূগোলের মাস্টারমশাই। কেউ সওদাগরি আপিসের কেরানি। এঁদের মধ্যে কারোরই গাড়ি নেই। নিদেন পক্ষে মফস্‌সলে একটা ছোটখাটো একতলা বাড়িও কেউ বানাতে পারেননি। যাকে বলে 'ছা-পোষা'—এঁরা সবাই হলেন তা-ই। এমন-কী এঁদের মধ্যে কেউই বিশেষ প্রতিভাবানও নন যে সমাজে নাম করবেন।

এ'খানে একটা প্রশ্ন উঠবে।

কেন কোনও কোনও লেখক শুধু একই ধরনের মানুষদের নিয়ে গল্প লিখতেই থাকেন? তিনি কি আর কোনও ধরনের মানুষকে চেনেন না?

এর উত্তরে বলতে হয়—কোনও লেখকের গভীর সহানুভূতি যে ধরনের মানুষের প্রতি, তাঁদের নিয়েই নানা গল্প দানা বাঁধে লেখকের মনে। গল্পের নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে তিনি সেইসব মানুষকে বাজিয়ে দেখেন। বুঝতে চান, তাঁর প্রিয় মানুষরা কোনও কঠিন পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দেন।

উদাহরণ না দিলে অবশ্য ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে না। সত্যজিতের 'বৃহচ্চঞ্চু' গল্পটা খুবই বিখ্যাত। তাই সেই গল্পের প্রধান চরিত্র তুলসীবাবুকেই বেছে নেওয়া যাক

উদাহরণ হিসেবে। প্রথমেই দেখা যাক, কে এই তুলসীবাবু। সত্যজিৎ রায় খুব পরিষ্কার করে তুলসীবাবুকে চিনিয়ে দিয়েছেন। লেখকের বর্ণনায়—

"ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটে তাঁর আপিসের যেখানে বসে তুলসীবাবু কাজ করেন, তার পাশেই জানলা দিয়ে পশ্চিম আকাশের অনেকখানি দেখা যায়। ... অবাক হবার ক্ষমতাটা সকলের সমান থাকে না ঠিকই, কিন্তু তুলসীবাবুর মধ্যে আদৌ আছে কি না সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। ... কবিরাজিটা তুলসীবাবু ধরেছেন বছর পনেরো হল। বাবা ত্রৈলোক্য সেন ছিলেন নাম-করা কবিরাজ। তুলসীবাবুর আসল রোজগার আরবাথনট কোম্পানির মধ্যপদস্থ কর্মচারী হিসেবে। কিন্তু পৈত্রিক পেশাটাকে তিনি সম্পূর্ণ এড়াতে পারেননি। ..."

এই কয়েকটা লাইনেই তুলসীবাবুর একটা স্পষ্ট পরিচয় আমরা পেয়ে গেলাম। তুলসীবাবু যে খুব একটা বেশি মাইনে পান না, এ'টুকু পরিষ্কার। তবে, টাকার অভাবটা বোধহয় উনি কবিরাজি করে পুষিয়ে নেন।

এ'রকম একটা চরিত্রকে নিয়ে গল্প লিখতে বসে নরেন্দ্রনাথ মিত্র কী করতেন, বাংলা সাহিত্যের যে কোনও অভিজ্ঞ পাঠক সেটা অনুমান করতে পারবেন। নরেন্দ্রনাথের কলমে এই তুলসীবাবু অবিবাহিত থাকতেন না। তাঁর হয়তো সদ্য-যুবতী একটি মেয়ে থাকত। সেই মেয়ের বেকার প্রেমিককে নরেন্দ্রনাথের লেখায় যথেষ্ট সস্নেহ প্রশ্রয় দেওয়া হত ... (এবং, এ'কথা না বললেও চলে যে, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কলমে সেই বিবাহিত তুলসীবাবুর গল্প হয়ে উঠত অমৃত-সমান।)

কিন্তু, স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের গল্পের ধারায় হাঁটলেন না সত্যজিৎ রায়। তাঁর তুলসীবাবুকে তিনি অন্য পথে নিয়ে গেলেন। কী-ভাবে?

সত্যজিৎ রায় তুলসীবাবুকে অদ্ভুৎ একটা অন্যরকম ঘটনায় জড়িয়ে দিলেন! সেটা হল—প্রাগৈতিহাসিক একটি প্রাণীর সংগে তুলসীবাবুর মোলাকাত!!

লেখক যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলেন—'কেরানি, মধ্যবয়স্ক এই তুলসীবাবুর কোনও ছেলে-মেয়ে নেই ঠিকই, কিন্তু নিজের সন্তানের বদলে তাঁকে যদি কোনও বন্য প্রাণীর দায়িত্ব নিতে হয়, তা'হলে কী করবেন তিনি? সেই বন্য প্রাণীকে তিনি কি সামলাতে পারবেন? কলকাতার মানুষ তুলসীবাবু। তাঁর ছোট্ট ফ্ল্যাটে কি ওই বন্য প্রাণীর জায়গা হবে? সেই প্রাণীকে তিনি কি খাইয়ে-দাইয়ে আদর-যত্নে বড় করে তুলতে পারবেন? যদি পারেন, কী করে সেটা সম্ভব হবে?

এ'খানেই শেষ নয়। তুলসীবাবুর বাড়িতে আশ্রিত সেই প্রাণী যদি এ'কালের প্রাণী না হয়? যদি সেই প্রাণী হয় প্রাগৈতিহাসিক এবং হিংস্র? তা'হলে কি তুলসীবাবু ভয় পেয়ে তাকে মেরে ফেলবেন?

এই কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর সত্যজিৎ রায় খুঁজলেন তুলসীবাবুর বাস্তব জীবনে। কী-ভাবে?

আগেই আমরা বলেছি, তুলসীবাবুর কবিরাজিতে আগ্রহ। তাই তিনি দন্ডকারণ্যের জঙ্গলে গিয়েছিলেন ভেষজ গাছপালার সন্ধানে। জঙ্গলের একটু বাইরে ভাড়া-করা-গাড়িটা রাখলেন তুলসীবাবু। তারপর, আধ ঘন্টা হেঁটে পৌঁছে গেলেন জঙ্গলের মধ্যে স্যাঁতসেতে একটা জায়গায়। যে গাছটা তিনি খুঁজছেন, এ'খানেই সেটা থাকার কথা। গাছটা খুঁজে পেতে দেরিও হল না। বিরাট একটা ডিম পড়ে ছিল গাছটার কাছেই। ময়াল সাপের ডিম ভেবে তুলসীবাবু সেটাকে পাত্তা দেননি। কিন্তু গাছের পাতা খানিকটা ছিঁড়তে-না-ছিঁড়তেই সেই বিরাট ডিমটা চৌচির হয়ে ফেটে গেল। আর সেটা থেকে বেরিয়ে এল বেশ বড় আকারের একটা পাখি। তার সরু সরু লম্বা পা। তার ঠোঁট বেখাপ্পা রকমের বড়। তার গায়ের রং বেগুনি!

যদিও এটা বিস্ময়কর পাখি, তবু তুলসীবাবু অবাক না হয়ে, আপন-মনে আরও খানিকটা ভেষজ পাতা ছিঁড়ে ঝোলায় পুরে ফিরে যেতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু সেটি হবার নয়! পাখি তাঁর ধুতির কোঁচা টেনে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। বাধ্য হয়ে তুলসীবাবু এই পাখির ছানাটাকেও ঝোলায় পুরে নিলেন! ফলে পাখিটা আশ্রয় পেল তুলসীবাবুর কলকাতার ফ্ল্যাটে! ...

তুলসীবাবু তখনও জানতেন না এই ছানাটা আসলে একটা প্রাগৈতিহাসিক পাখি! এই পাখি ছিল উটপাখির চেয়েও বড়! আর এই পাখি ছিল হিংস্র শিকারী ও ভয়ংকর মাংসাশী। এ'রকম কোনও পাখিকে বাড়িতে আনাই বিপজ্জনক। তবু, কিচ্ছু না জেনে, তুলসীবাবু নিজের বাড়িতেই রেখে দিলেন পাখির ছানাটাকে। ... *(শেষে কী হল, সে' কথা মূল গল্প থেকে পড়ে নেওয়াই ভাল।)*

এতক্ষণে, তুলসীবাবুকে ঘিরে ঘটনা যে' ভাবে এগিয়েছে, তাতে একটা নকশা ফুটে উঠেছে পাঠকের চোখের সামনে। নকশাটা এই-রকম—

কোনও নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষকে বাইরে থেকে দেখে খুবই সাধারণ বলে মনে হতে পারে। সেটা মনে হওয়াই তো স্বাভাবিক। কারণ, দৈনন্দিন জীবনের বাইরে তাঁকে দেখার কোনও সুযোগই আমরা পাই না। তাই তথাকথিত সেই 'ছা-পোষা' মানুষের ভিতরে কতটা শক্তি লুকিয়ে আছে, তা আমরা টেরই পাই না। আর সেই মানুষটা নিজেও নিজের গোপন শক্তির সন্ধান পান না। তাই আপিসে বস-এর সামনে সদাই তিনি কাঁচুমাচু হয়ে থাকেন। গল্প লেখার জন্য এ'রকমই একজন মানুষকে বেছে নেন সত্যজিৎ রায়। তারপর, তাঁকে অসম্ভব কঠিন কোনও ঘটনায় জড়িয়ে ফেলেন। এমন একটা ঘটনা, সারা পৃথিবীতে যার জুড়ি মেলা ভার। যেমন, 'বৃহচ্চঞ্চু' গল্পে হিংস্র প্রাগৈতিহাসিক পাখির সংগে ছা-পোষা কেরানির মোলাকাত, 'অসমঞ্জবাবুর কুকুর' গল্পে এমন একটা কুকুরকে পুষলেন পোস্ট অফিসের একজন কেরানি—যে কুকুরটা হাসতে পারে, সরকারি ইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নিশিকান্তবাবু এমন একটা ফল আবিষ্কার করলেন 'ম্যাকেঞ্জি ফ্রুট' গল্পে—যে ফলের এক-টুকরো খেলেই সমস্ত রোগ চিরকালের মতো সেরে যায় ...

ঠিক এই প্রসঙ্গে এক ধরনের বাঙালি মানসিকতারও পরিচয় তুলে ধরেন সত্যজিৎ রায়। মনে পড়ে জগদীশচন্দ্র বসুর কথা। ইতালীয় বিজ্ঞানী মার্কনির আগে বেতার তরঙ্গ আবিষ্কার করেন জগদীশচন্দ্র। কিন্তু তিনি তাঁর আবিষ্কারের পেটেন্ট নেবার প্রয়োজন বোধ করেননি। হয়তো এ' কথাটা তাঁর মনেও আসেননি। সত্যজিতের গল্পের তুলসীবাবু কিংবা নিশিকান্তবাবুর নির্লিপ্তি যেন জগদীশচন্দ্রের মানসিকতারই প্রতিফলন। ওই প্রাগৈতিহাসিক পাখির আবিষ্কারক হিসেবে তুলসীবাবু নিজের নাম প্রচারের ব্যবস্থা করেননি। সাংবাদিক সম্মেলনও ডাকেননি। 'ম্যাকেঞ্জি ফ্রুট' গল্পের নিশিকান্ত বাবুও তাঁরই আবিষ্কার ওই ফলকে নিজের নামে পেটেন্ট করার চেষ্টা করেননি। ব্যবসাবুদ্ধির এই অভাব বোধহয় একমাত্র বাঙালিকেই মানায়।

সত্যজিৎ রায় এইরকম নানা অভাবনীয় ঘটনার মধ্যে দিয়ে তাঁর প্রিয় 'ছা-পোষা' মানুষটাকে নিয়ে যান আর নিজেই পরখ করে দেখেন, সেই মানুষটা কী-ভাবে নিজের সাহস দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, সততা দিয়ে সেই সমস্যার সমাধান করছেন। এটাই সত্যজিৎ রায়ের গল্পের মূল নকশা।

একটু আগেই তিনটে শব্দ ব্যবহার করলাম সত্যজিতের গল্পের চরিত্রদের বৈশিষ্ট্য বোঝানোর জন্য। (১) সাহস, (২) বুদ্ধি ও (৩) সততা। এই তিনটি শব্দই মূল্যবান, তাই সত্যজিতের ছোটগল্পের প্রসঙ্গে এই তিনটি শব্দের তাৎপর্য একটু ভেঙে বলা দরকার। 'বৃহচ্চঞ্চু' গল্পের তুলসীবাবুর জীবনেই এই তিনটি শব্দকে প্রয়োগ করে দেখা যাক।

তুলসীবাবুর প্রথম গুণটা হল তাঁর সাহস। একটা অজানা পাখির ছানাকে তিনি তো জঙ্গল থেকে নিয়ে এলেন। পাখিটা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠতে লাগল। ছুঁচলো কঠিন ঠোঁট দেখেই বোঝা যায়, পাখিটা মাংসাশী। একদিন পাখিটা পাড়ার একটা বেড়ালকে খুনও করে ফেলল! তবু তুলসীবাবু একটুও ভয় পেলেন না। পাখিটাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার কথাও ভাবলেন না। নিজের পোষা পাখির উপর তিনি বিশ্বাসও হারালেন না। একবারও ভাবলেন না—এই পাখিটা একদিন তাঁকেই খুন করতে পারে। এ'খানেই তাঁর সাহসের পরিচয়; যে সাহস যেমন বিস্ময়কর, তেমনই বিরল।

সত্যজিতের চরিত্রদের দ্বিতীয় গুণ, তাঁদের বুদ্ধি। এই বুদ্ধির পরিচয় কীভাবে পাওয়া গিয়েছিল এই তুলসীবাবুর জীবনের, এবার সেটা পরখ করে দেখি।

বুদ্ধিমান মানুষের মধ্যে একটা বড় চিহ্ন দেখা যায়। সেটা হল, আগুয়ান বিপদকে বুঝতে পেরেও ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা। যেদিন নিজের শক্ত লোহার তারের খাঁচা ভেঙে রাক্ষুসে পাখিটা বেরিয়ে এল—তার পরদিনই তুলসীবাবু পাখিটাকে জঙ্গলে ফিরিয়ে দিয়ে আসার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু কী দেখে তুলসীবাবু বুঝলেন, পাখিটা আর যাই করুক—তাঁর কোনও ক্ষতি করবে না? আসলে যেদিন রাতে পাখিটা খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে এসেছিল, সেই রাতেই লোহার তার কাটার আওয়াজ পেয়ে

তুলসীবাবু ঘুম ভেঙে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি দেখলেন খাঁচায় পাখিটা নেই। সে পৌঁছে গেছে বারান্দার অন্য প্রান্তে। টর্চের আলো ফেলতেই দেখা গেল—পাখিটার বিরাট বাঁকানো ঠোঁটে ধরা আছে একটা বেড়াল। মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করছে বেড়ালটা। তুলসীবাবু শুধু ধমকের সুরে একবার বললেন—"চঞ্চু!" অমনি চঞ্চু বেড়ালটাকে ঠোঁট থেকে ফেলে দিল! তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে নিজের ভাঙা খাঁচায় গিয়ে ঢুকল। এটা দেখেই তুলসীবাবু বুঝলেন, পাখিটা বিলক্ষণ তাঁর পোষ মেনেছে। সুতরাং, এই পাখির দিক থেকে তাঁর নিজের ভয়ের কোনও কারণ নেই। এটা বুঝতে পারার মধ্যে দিয়েই তুলসীবাবুর বুদ্ধি আর সাহসের পরিচয় একসঙ্গে পাওয়া যায়। পাখিটা যে 'খুনি' হয়ে উঠতে পারে, এটা বুঝতে পেরেও তুলসীবাবু আতংকিত হলেন না। ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিলেন—চঞ্চুকে তিনি তার জন্মস্থানেই রেখে আসবেন। বিপদের সময় এই যে মাথা ঠান্ডা রাখার ক্ষমতা—এটাই তাঁর বুদ্ধির পরিচয়।

এবার আমরা যা নিয়ে আলোচনা করব, তা হল তুলসীবাবুর সততা। এ'রকম একটা আশ্চর্য পাখিকে হাতের মুঠোয় পেয়েও তাকে বিক্রি করে বিপুল টাকা রোজগারের কথা একবারও ভাবেননি তুলসীবাবু। এটা ১৯৮০'র ঘটনা। তখনও সার্কাসে হিংস্র প্রাণীর খেলা দেখানোটা বে-আইনী বলে ঘোষিত হয়নি। সুতরাং, তুলসীবাবু তাঁর পোষা চঞ্চুকে কোনও বড় সার্কাসের দলে বিক্রি করে দিতে পারতেন। আরও লোভী হলে বিদেশী কোনও সার্কাসের সংগেও যোগাযোগ করতে পারতেন। এমনকী আমেরিকার কোনও চিড়িয়াখানায় বিক্রি করে দেওয়াটাও আশ্চর্য কিছুই ছিল না। কিন্তু সে'রকম কোনও সম্ভাবনার কথা মনেও স্থান দেননি তুলসীবাবু।

এ'খানে একটা প্রশ্ন উঠবেই। তুলসীবাবু যে চঞ্চুকে বিক্রি করেননি—তাতে তাঁর চরিত্রের নির্লোভ দিকটা প্রকাশিত হল। কিন্তু এর সঙ্গে 'সততা'র ততোটা সম্পর্ক আছে কি?

এ'খানে কেন তুলসীবাবুকে সৎ বলা হচ্ছে—সেটা আর একটু ভেঙে বলা দরকার। আসলে যে'দিন তুলসীবাবু এই প্রাগৈতিহাসিক পাখিটাকে 'মানুষ' করবেন বলে জঙ্গল থেকে তুলে এনেছিলেন, সে'দিনই পাখিটার সঙ্গে তাঁর নীরব একটা মানবিক 'চুক্তি' হয়েছিল। কোনও বাবা যখন তাঁর সদ্যোজাত সন্তানকে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে নিয়ে আসেন, তখন যে-চুক্তি পিতা ও সন্তানের মধ্যে গড়ে ওঠে—তুলসীবাবুর সংগে এই পাখির 'চুক্তি'টাও সেই জাতের। অর্থাৎ, নিজের বাড়িতে আনার সময়ই বাবা অকথিত কথা দিচ্ছেন—সন্তানকে নিজের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে মানুষ করবেন। সন্তান 'অদ্ভূত' হলেও তাকে মেলায় বিক্রি করে দেবেন না। তাকে শিশু-শ্রমিক হিসেবে খাটিয়ে রোজগার করবেন না ... ইত্যাদি।

এ'খানে লক্ষ করার মতো, এই প্রতিশ্রুতিগুলো তুলসীবাবুও রক্ষা করেছেন তাঁর পোষা পাখিটার জীবনে। যেন তিনিই এই প্রাগৈতিহাসিক পাখির আসল বাবা। আর

এইখানেই তুলসীবাবু সৎ। নিজের পিতৃসুলভ মানবিক প্রতিশ্রুতিকে তিনি সৎভাবে পালন করেছেন।

সত্যজিৎ রায়ের ছোটগল্পের চরিত্ররা পাঠকের মনে চিরস্থায়ী জায়গা করে নেয় তাদের সাহস, বুদ্ধি আর সততার জোরে।

সত্যজিতের গল্পে আরও এক ধরনের চরিত্রের দেখা বার বার পাওয়া যায়, যাদের তেমনভাবে লেখাপড়াও হয়নি। বোধহয় হবার কথাও নয়। কারণ, তারা সবাই এসেছে সমাজের একেবারে নিম্নস্তর থেকে। সুতরাং, তাদের বাবারা তাদের লেখাপড়া শেখানোর কথা সে'ভাবে চিন্তাই করেননি। তথাকথিত 'অশিক্ষা' সত্ত্বেও এই চরিত্রদের নানা-রকম প্রতিভা আছে। রোজগারের তাগিদে আর সৃষ্টির আনন্দে তারা সেইসব প্রতিভার উপরেই নির্ভর করেছে। এই জাতের কোন কোন মানুষের দেখা পেয়েছি তাঁর গল্পে, তার একটা তালিকা দেওয়ার চেষ্টা করি। তা'হলেই গল্পকার সত্যজিতের আগ্রহের পরিধিকে আমরা অনুমান করতে পারব।

ভবঘুরে গল্প-বলিয়ে ('টেরোড্যাকটিলের ডিম'), অখ্যাত ম্যাজিশিয়ান ('দুই ম্যাজিশিয়ান'), রাস্তার ধারের বুদ্ধিমান পাগল ('শিবু আর রাক্ষসের কথা'), সিনেমার এক্সট্রা ('পটলবাবু ফিল্মস্টার'), অখ্যাত খামখেয়ালি বৈজ্ঞানিক ('প্রোফেসার হিজিবিজবিজ'), রাস্তার জাগ্‌লার ('ফটিকচাঁদ'), ভেন্ট্রিলোক্যুইস্ট ('ভুতো'), শখের মেক-আপ আর্টিস্ট ('বহুরূপী'), পৌরাণিক কাহিনী ও ছোটদের গল্পের ইলাস্ট্রেটার ('মানপত্র'), বাংলা সিনেমার কমেডিয়ান ('জুটি'), সিনেমার স্টান্টম্যান ('মাস্টার অংশুমান'), হরবোলা ('সুজন হরবোলা'), সৎ গৃহভৃত্য ('কাগ্‌তাড়ুয়া'), অখ্যাত লেখক ('শিশু সাহিত্যিক'), গল্প-বলিয়ে গৃহভৃত্য ('অভিরাম')।

এইরকম মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত বোধহয় 'ফটিকচাঁদ'-এর হারুনদা।

হারুনদা নানা-জায়গায় জাগলিং দেখিয়ে বেড়ায়। ধর্মতলায় শহীদ মিনারের নীচে প্রতি রবিবার বিকেলে যে মেলা বসে—সেই মেলাই হল হারুনদার জাগলিং দেখানোর আসল জায়গা। নানা জেলা থেকে নানা-রকম শিল্পী আসেন এই মেলায়। ম্যাজিক, জাগলিং, ছোটখাটো সার্কাস—কী না হয় এই মেলায়! এখন হারুনেরও প্রধান রোজগারটা হয় এই মেলায় পিতলের বলের জাগলিং দেখিয়ে।

হারুন খুব একটা লেখাপড়া শেখেনি। সে এন্টালি অঞ্চলের এক বস্তিতে থাকে। কিন্তু এটাই কি তার শেষ পরিচয়? তা কিন্তু নয়। কলকাতার এক বিখ্যাত ব্যারিস্টারের ছেলে কিডন্যাপারদের হাত থেকে ছাড়া পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তার সম্পূর্ণ স্মৃতিভ্রম হয়েছিল। নিজের নাম, বাড়ির ঠিকানা কিছুই তার মনে পড়ছিল না! এই অবস্থায় ছেলেটিকে উদ্ধার করেছিল ওই জাগলার হারুন। ও'দিকে ছেলের বাবা কাগজে

বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন—তাঁর ছেলেকে যে ফিরিয়ে দিতে পারবে, তাকে তিনি মোটা অংকের টাকা পুরস্কার দেবেন। হারানো ছেলেটাকে হারুন ফিরিয়ে দিয়েছিল ঠিকই কিন্তু পুরস্কারের টাকা হারুন নেয়নি। কিন্তু তাই বলে কি হারুনের টাকার দরকার নেই? নিশ্চয়ই আছে। হাজার বার আছে। তবু হারুন ছেলেটাকে বলেছিল—"তোর বাবাকে বলিস, হারুনদা বলেছে ওঁর ছেলেকে ফেরত দিয়ে পাঁচ হাজার টাকা নিতে আমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু ভাইকে বিক্রি করে কেউ টাকা নেয়?"

হারুনের মধ্যেও সেই নির্লোভ সততার দিকটা ফুটে উঠছে—যেটা আমরা দেখেছি 'বৃহচ্চঞ্চু'র তুলসীবাবুর মধ্যে, কিংবা 'ম্যাকেঞ্জি ফ্রুট' গল্পের নিশিকান্তবাবুর মধ্যে। এ'খানেই আমরা বুঝতে পারি, এটাই হল তাঁর পাঠকদের প্রতি সত্যজিতের বার্তা। নিজের জীবনে এই গুণটিকে চিরকাল মূল্য দিয়েছেন সত্যজিৎ রায়। আর এই গুণগুলোই তিনি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন তাঁর তরুণ পাঠক-পাঠিকার মধ্যে।

এই প্রসংগে অবশ্য একটা জরুরি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দরকার। এই জাতের মানুষ কোথায় দেখলেন সত্যজিৎ রায়? বহু বছর কাছ থেকে না দেখলে তো এ'রকম মানুষের প্রতি এতটা মায়া জন্মানো সম্ভব নয়।

এই প্রশ্নের সহজ উত্তর হল—এ'রকম মানুষরাই ঘিরে রাখতেন সত্যজিৎ রায়কে। কর্মসূত্রে এঁদের সংগেই তাঁর মেলামেশা করতে হত। কী ভাবে?

প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভাল, একজন ব্যস্ত ও পেশাদার চলচ্চিত্র পরিচালককে তাঁর ফিল্ম ইউনিটের সদস্যদের সংগেই বেশি করে মিশতে হয়। প্রচণ্ড ব্যস্ততার জন্য ইউনিটের বাইরের লোকদের সংগে মেলামেশার মতো অবসর সময় চলচ্চিত্রকারদের জীবনে থাকে না বললেই চলে। সত্যজিৎ রায়ের জীবনেও এটাই ঘটেছিল।

রবীন্দ্র শতবর্ষের বছর থেকে সত্যজিৎ রায় গল্প লিখতে শুরু করেছিলেন। ঠিক সেই সময় যাঁরা ছিলেন তাঁর ফিল্ম ইউনিটের সদস্য, তাঁদের মধ্যে অনেকেই অবিবাহিত ছিলেন। যেমন আলোকচিত্রশিল্পী সৌম্যেন্দু রায়, শিল্প নির্দেশক বংশী চন্দ্রগুপ্ত, সহকারী পরিচালক সুব্রত লাহিড়ী, প্রোডাকশন কন্ট্রোলার অনিল চৌধুরী, ব্যবস্থাপক ভানু ঘোষ। *(এঁরা সারা জীবনই অবিবাহিত ছিলেন।)* এ'কথা ঠিক যে, অবিবাহিত বলে এই পাঁচজনকে নিজেদের সংসারের দায়িত্ব নিতে হয়নি। সত্যজিতের ফিল্ম ইউনিটে যোগ দেবার আগে থেকেই এঁরা খুব গুণী ছিলেন, তা কিন্তু নয়। তবু সত্যজিৎ রায়ের সংগে কাজ করতে আসার পর এই পাঁচজনের মধ্যেই অভাবনীয় সব গুণের প্রকাশ ঘটতে লাগল। যেমন, আলোকচিত্রী সৌম্যেন্দু রায়ের কথাই ধরা যাক। সামান্য ক্যামেরা কেয়ারটেকার হিসেবে ইনি যোগ দিয়েছিলেন 'পথের পাঁচালী'র ইউনিটে। সেই অবস্থা

থেকে তিনি 'তিন কন্যা' ছবির প্রধান আলোকচিত্রী হলেন। তারপর, ১৯৭০-এর দশকে, 'অশনি সংকেত' ছবিতে, তিনি বাংলায় রঙিন ফোটোগ্রাফিকে উন্নতির এমন একটা স্তরে পৌঁছে দিলেন, যে সারা পৃথিবীর রসিকজনের নজর কেড়ে নিল বাংলার রঙিন ফোটোগ্রাফি। এ'খানেই আমরা সত্যজিৎ রায়ের ছোটগল্পের মূল নকশাটিকে দেখতে পাই। এই সৌম্যেন্দু রায় যেন সত্যজিতের ছোটগল্প থেকেই উঠে আসা কোনও চরিত্র। অবিবাহিত, আপাত-সাধারণ এই মানুষটিই একদিন পৃথিবীর ফোটোগ্রাফি রসিক দর্শকদের নজর কেড়ে নিলেন। কিংবা, ঘুরিয়ে বলা যায়—সাধারণত্বের সীমানা ভাঙার যে সাহস সৌম্যেন্দু রায় দেখিয়েছিলেন, তার থেকেই হয়তো গড়ে উঠেছিল সত্যজিতের ছোটগল্পের মূল নকশা।

শুধু সৌম্যেন্দু রায় কেন, শিল্প নির্দেশক বংশী চন্দ্রগুপ্ত নিজেও পড়েন এই মূল নকশার মধ্যে। ছবি এঁকে সুনাম অর্জন করতে পারেননি। কিন্তু 'পথের পাঁচালী', 'জলসাঘর', 'চারুলতা', কিংবা 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী' ছবিতে এই বংশী চন্দ্রগুপ্তের তৈরি সেট্ সারা পৃথিবীর সিনেমা-প্রেমীদের নজর কেড়ে নিয়েছিল। একশো বছরের আন্তর্জাতিক শিল্প নির্দেশনার ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে আছেন। থাকবেনও।

সুতরাং, এটা অনুমান করে নেওয়া অযৌক্তিক হবে না —বংশী চন্দ্রগুপ্ত বা সৌম্যেন্দু রায়ের মতো আপাত-নিরীহ মানুষের মধ্যেই আমরা খুঁজে পাই সত্যজিৎ রায়ের 'বৃহচ্চঞ্চু' গল্পের তুলসীবাবুর ছায়া।